International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-IV, July 2024, Page No.71-82
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i4.2024.71-82

বাংলা রহস্য ছোটগল্প : সত্যজিৎ রায়ের গল্প ভুবন

অপরাজিতা ভট্টাচার্য
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম, ভারত

Abstract:

Satyajit Ray, an iconic figure in Indian cinema and literature, is renowned for his contributions to the detective genre. Born in 1921 in Kolkata, Ray's legacy spans multiple creative fields, but his detective stories, particularly those featuring the sleuths Feluda and Professor Shonku, hold a special place in Bengali literature.

Ray introduced Pradosh Chandra Mitra, popularly known as Feluda, in 1965. Feluda, a sharp, intuitive private investigator, along with his cousin Topshe and the quirky thriller writer Jatayu, solves complex mysteries with a mix of wit, intellect, and action. Ray's portrayal of Feluda is marked by intricate plots, vivid descriptions of various locales, and a strong sense of morality and justice.

In addition to Feluda, Ray created Professor Shonku, an eccentric scientist with a penchant for adventure. Shonku's stories blend science fiction with detective elements, showcasing Ray's imaginative prowess and his ability to intertwine scientific concepts with narrative intrigue.

Ray's detective stories are celebrated for their engaging characters, meticulous plotting, and cultural richness. They reflect his deep understanding of human nature and society, making them timeless classics that continue to captivate readers of all ages.

গল্প সাহিত্যের অন্যতম শাখা হিসাবে সাহিত্য তথা পাঠক মহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গল্প হচ্ছে এমন একটি বিষয় যখানে স্থান পেয়েছে সমাজ, সমাজের মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ, পরিস্থিতি সবকিছুই। আসলে গল্প হচ্ছে এমন একটি বিষয় যেখানে গল্পকার তথা গোটা সমাজের মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জায়গাটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। গল্প হচ্ছে স্বল্প পরিসরে বর্ণিত এক উপাখ্যান। সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটিকে কেন্দ্র করে সাধারণত গল্প রচিত হয় এবং এই গল্পগুলিই আসলে মানবজীবনের এক খণ্ডাংশ। সীমিত পরিসরে নিজস্ব ভঙ্গিতে কোনো ঘটনাকে বিবৃত করাই হল গল্পের মূল উদ্দেশ্য। আসলে গল্প হল এমন একটি বিষয় যেখানে সহজে বিভিন্ন তথ্যকে অনেক সীমিতভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। গল্প বলতে কোনো একটি ঘটনা বা অনেকগুলো ঘটনার লিখিত রূপকেই বোঝানো হয়ে থাকে। গল্প নানা ধরনের হতে

পারে যেমন ছোটগল্প, বড়গল্প, রূপকথার গল্প, শিশুদের গল্প, কিশোরদের গল্প, ভৌতিক গল্প, রহস্য গল্প।

গল্পের একটি বৃহত্তর অঙ্গ হিসাবে আমরা রহস্যগল্পকে দেখতে পারি। রহস্যগল্প সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা যেখানে প্রকাশিত হয় কিছু রোমাঞ্চকর ঘটনা। যেখানে থাকে টান টান উত্তেজনার কিছু বিশেষ মুহুর্ত। রহস্য গল্পের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যায় জটিলতম পরিস্থিতি, কিছু রহস্যে ঘেরা ঘটনা, তাঁর পটভূমি এবং চরিত্রের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে রহস্য ভেদের প্রক্রিয়া। এই ধারার গল্প পাঠে পাঠকদের মনোজগতে এবং তাদের চিন্তাশক্তিতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আসলে এই ধারার গল্পগুলোতে পাঠকসমাজে রহস্যময় ঘটনা উদ্ঘাটন এবং জটিল সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যায় তা প্রাধান্য পায়। রহস্য গল্পের মূলে রয়েছে এক জটিলতম পরিস্থিতি সমাধানের তীব্র আনন্দ। রহস্যগল্প লেখার কয়েকটি উপাদান রয়েছে, বা বলা যায় কয়েকটি উপাদানের উপর নির্ভর করে রহস্যগল্প লেখা সম্ভব হয়ে উঠে। সেগুলো হল-

১) প্রারম্ভিক অংশ- যেখানে গল্পের শুরুতেই সাধারণত একটি রহস্যময় বা জটিলতম সমস্যার বর্ণনা থাকে যা গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করে।
২) গোয়েন্দার পরিচয়- দ্বিতীয় উপাদান হিসাবে রয়েছে গোয়েন্দার পরিচয়। যেখানে প্রারম্ভিক অংশের পরেই গোয়েন্দা বা প্রধান চরিত্রের পরিচয় করানো হয়, যার মাধ্যমে রহস্যের সমাধান করা হবে।
৩) তদন্তের পর্যায়- তৃতীয় উপাদান হিসাবে আসে তদন্তের পর্যায়। এই পর্যায়ে গোয়েন্দা বিভিন্ন সূত্র ধরে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করে। এই পর্যায় আলোচনা করে পাঠকও বিভিন্ন সূত্র সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন।
৪) ক্লাইম্যাক্স- রহস্য সমাধানের আগে পাঠকমহলে এক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই উপাদানে গল্পের গতি অ, যেখানে অতি দ্রুত হয় এবং পাঠককে এক চিন্তার মধ্যে রেখে দেয় যে কিভাবে রহস্যের উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে।
৫) সমাধান- গল্পের শেষ এবং অন্তিম পর্যায় হল সমাধান। পাঠকমহল বেড়াজাল ছিন্ন করে সমাধানের পথে পা বাড়ায়।

রহস্যগল্পের নির্মাণ শিল্প নির্ভর করে আবার একাধিক উপাদানের উপর। যেমন প্লট, তাঁর গঠন রীতি, পরিবেশ এবং প্রেক্ষাপট, কীভাবে বর্ণনা করা যায় তাঁর ধরন, তাঁর ভাষা এবং শৈলী। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনার সুষম বন্টন ও সমান্তরাল ভাবে ক্লু প্রদানের কৌশল এই পর্যায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। রহস্য গল্পে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ, রহস্যময় ঘরবাড়ি, অজানা স্থান, বৈদ্যুতিক আলোহীন পরিবেশ ইত্যাদি পাঠকের মন অনেকটা আকর্ষণ করে। রহস্য গল্পে বর্ণনার ধরণ গল্পের এক অনন্য মাত্রা প্রদান করে। সংলাপ, বর্ণনা এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো গল্পের রহস্য সমাধান করা হয়। সাধারণত রহস্য গল্পের ভাষা সরল, সরস এবং নির্ভেজাল হয়, যাতে পাঠক সমাজ খুব সহজে তা বুঝতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে গল্পের ভাষা লেখকের নিজস্ব প্রকার ও ভঙ্গীতে বা শৈলীর মাধ্যমে অলংকারময় হয়ে থাকে।

কিন্তু রহস্যগল্প গল্পের আঙিনায় এমনি এমনি চলে আসেনি,তারও রয়েছে এক বিশাল ইতিহাস।

> “...আমাদের দেশের অপরাধগুলো ভীরু ও নির্বোধ, অপরাধগুলো নিজীব ও সরল, তাহার মধ্যে দুরূহতা দুর্গমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের খুনি নর রক্তপাতের উৎকট উত্তেজেনা কোনোমতেই নিজেদর মধ্যে অববরণ করতে পারে না। জালিয়াত যে জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলম্বে নিজেই আপাতমস্তক জড়াইয়া পড়ে। অপরাধবুহ্য হতে নির্গমনের কূটকৌশল সে কিছুই জানে না।”[১]

রহস্য গল্পের ইতিহাসের গোড়ার কথা বলা যায় প্রাচীন সভ্যতার মিথ এবং লোককাহিনির মধ্যে। মানুষ যখন লিখিত শব্দের মাধ্যমে তাঁর অভিজ্ঞতা, কল্পনা এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে শুরু করে, তখন থেকেই রহস্য গল্পের জন্ম। এটি সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সাহিত্যের ধারায় তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রাচীন গ্রীসে, সাপোক্লিসের ‘ঈডিপাস রেক্স’ এবং হোমারের ‘দ্য ওডিসি’ মত নাটক এবং মহাকাব্যে রহস্য ও তদনের উপাদান ছিল। মধ্যযুগে, দান্তে এবং আলিগিয়েরির ‘ডিভাইন কমেডি’ এবং চসারের ‘ক্যানটারবেরির টেলস’ এও রহস্যের উপাদান ছিল। এই সময়ে, রহস্য গল্প সরাসরি অপরাধের সাথে যুক্ত না হলেও, অজানা এবং অলৌকিক বিষয় নিয়ে কৌতূহল ও গবেষণার একটি বড় বিষয় ছিল। আঠারো শতকের শেষের দিকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রহস্য গল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে। গথিক উপন্যাসের মধ্যে রহস্য এবং ভয়াবহতার মিশ্রণ দেখা যায়। হোরেস ওয়াল্পোলের ‘দ্য ক্যাসল অফ ওত্রান্তো’(১৭৬৪) এবং মেরি শেলির ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’ (১৮১৮) এই ধরনের উপন্যাসের উদাহরণ। এসব উপন্যাসে ভূত, অপদেবতা এবং অচেনা অজানা ভয়াবহতা ছিল, যা পাঠকদের মনে এক উত্তেজনার সৃষ্টি করত।

রোমাঞ্চকর পরিবেশে শিরশিরে অনুভূতি, পাঠককে অনেক সাহস ও বুদ্ধি দিয়ে তা সমাধান করা এবং তার সঙ্গে রয়েছে থ্রিলার এবং ক্লাইম্যাক্সের পরিপূর্ণতা। আলোচ্য রহস্য গল্পগুলিতে দেখা যায় যে , গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তাঁর এক সাধারণ জনজীবনে হঠাৎ একদিন এমন এক বিকৃত সমস্যার সম্মুখীন হয় যেখানে তা সমাধান করার জন্য নিজেকেই সেই সমস্যার উপর ঝাপিয়ে পড়ে তার সমাধান করতে হয়। রহস্য গল্পের সেই ধারার সঙ্গে পাঠক মহলের বিশেষ পরিচয় থাকলেও, প্রথমে তাঁর পরিচয় ঘটে ১৮৪১ সালে এডগার অ্যালান পো’র ‘The Murders In The Rue Morgue’ নামক এক বিখ্যাত গল্পে। এই গল্পের মাধ্যমে গল্পাকার পাঠকদের সাথে আলাপ করিয়ে দেন বিখ্যাত ফরাসি চরিত্র সি অগাস্ট দুপের সাথে। তিনিই বিশ্বের প্রথম গোয়েন্দা, যিনি অনেক তথ্য যোগাড় করে এক নিমেষেই জটিলতম রহস্যের সময়াধান করতে পারতেন। এই বিখ্যাত চরিত্রকে অ্যালান পো সাহিত্যের দরগোরায় নিয়ে আসেন ১৮৪২ সালে প্রকাশিত ‘The Mystry Of Mary Roget’ এবং ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত ‘The Purloined Letter’ গল্প দুটির মধ্য দিয়ে।

শতাব্দীর শেষ দিকে সাধারণত রহস্য গল্প বা গোয়েন্দা গল্পের আগমন। কিন্তু এর আগেও যে গোয়েন্দা গল্প লেখা হয়নি তেমনটা মোটেই নয়। এই হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি ‘বরকতউল্লার

দপ্তর' গল্পের কথা। বরকতউল্লা ছিলেন একজন পুলিশ দারোগা যিনি ঠগী দমনে নিযুক্ত ছিলেন এবং এই কাহিনির উপর ভিত্তি করেই ১৮৮৮ সালে গিরিশচন্দ্র বসুর 'সেকাল দারোগার কাহিনী' গল্পটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তারপরেও বলা যায় যে বাংলা রহস্য গল্পের সূচনাংশে যে বইটির উল্লেখ আসে সেটি হল প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'দারোগার দপ্তর' গল্পটি যা প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস চরিত্রটি গোয়েন্দা গল্পের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। শার্লক হোমস এবং ড. জন ওয়াটসনের জুটি রহস্য গল্পের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় জায়গা দখল করে আছে। ড্যেলের লেখা গল্পগুলোতে, হোমসের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং যুক্তিবাদী পদ্ধতি অপরাধ সমাধানের একটি নতুন রীতি প্রবর্ত্ন করে।

তাছাড়া ব্যোমকেশ বক্সীর নাম আমাদের সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। যার বানলা রহস্য গল্পের ধারায় সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৩২ সালে 'সত্যান্বেষী' দিয়ে। কিন্তু অনেক গল্পে দেখা যায় ব্যোমকেশ নিজেকে গোয়েন্দা বলে নয়, নিজেকে সত্যান্বেষী হিসেবে পরিচয় দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। বিংশ শতাব্দীতে রহস্য গল্প বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আগাথা ক্রিস্টি, রেমন্ড চ্যান্ডলার এবং ড্যাশিয়েল হ্যামেট প্রমুখ লেখকরা গোয়েন্দা এবং অপরাধ কাহিনির ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেন।

সত্যজিৎ রায় খ্যাত বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র ফেলুদা ওরফে ফেলু মিত্তির ওরফে প্রদোষচন্দ্র মিত্র, এই নামটি কোনো বাঙালি পাঠক শোনেননি তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ১৯৬৫ সালে 'সন্দেশ' পত্রিকায় বের হয় তাঁর প্রথম গল্প 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' এবং সেটা শুরু হয় তাঁর প্রথম পথ চলা এবং তাঁর লিখিত আরেকটি গল্প 'ইন্দ্রজাল রহস্য' দিয়ে তার শেষ লাইন টানলেও পাঠক মহলে ফেলুদা সম্পর্কে সেও উচ্ছ্বাস বিন্দুমাত্র কমেনি। তাই যখনই কোনো বাঙালি গোয়েন্দার নাম বলার অবকাশ আসে তখন সর্বাগ্রে ফেলু মিত্তিরের নাম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। আধুনিক রহস্য গল্প বিভিন্ন ধারায় এবং মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের পাশাপাশি, সিনেমা, টেলিভিশন সিরিজ এবং অনেক ওয়েব সিরিজেও রহস্য গল্পের জনপ্রিয়তা আজও দেখা যায়। লেখকরা এখন ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং বিষয়বস্তুতে রহস্য গল্প উপস্থাপন করছেন। এই সময়ের কিছু পাশ্চাত্য লেখকরা হলেন জেমস প্যাটারসন, গিলিয়ান ফ্লিন এবং হারলান কোবেন। প্রাচ্য অর্থাৎ বাঙালি লেখকরা হলে সত্যজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মতো বিখ্যাত লেখক।
রহস্য গল্পের ইতিহাস বহু দীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ। এটি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব এবং যুগের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিবৃত হয়েছে। রহস্য গল্প মানুষের কৌতূহল, বুদ্ধি এবং উত্তেজনার প্রিয় মাধ্যম হিসাবে আজও সমাজ জনপ্রিয়।

বাংলা রহস্য গল্পে সত্যজিৎ রায়ের দক্ষতা: সত্যজিৎ রায় ছিলেন একজন বিখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক, তেমনি বাংলা সাহিত্যের তাঁর অবদানের কোনো সীমা নেই। তাঁর বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র আজও প্রত্যেক বাঙালির মননে ও চিন্তনে রয়েছে। এছাড়াও তাঁর আরও কয়েকজন গোয়েন্দা চরিত্র হল তারিণি খুড়ো এবং প্রফেসর শঙ্কু। কিন্তু সর্বাগ্রে যার নাম উত্থাপিত হয় তিনি হলেন ফেলুদা ওরফে প্রদোষ মিত্র। ফেলুদা সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্ট বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয় প্রতীক। ফেলুদা চরিত্রের অন্যতম দিক হল তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সূচালো পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। সে যে কোনো

রহস্য সমাধানের ক্ষেত্রে তার বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে কাজে লাগায়। তার এই বুদ্ধিমত্তা তাকে জটিল এবং গভীর রহস্য উদ্ঘাটনে সহায়তা করে। এ ছাড়াও, ফেলুদার আছে অসাধারণ জ্ঞানপিপাসা। সে প্রচুর পড়াশোনা করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান রয়েছে। সত্যজিৎ রায় তার চরিত্রকে এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে, ফেলুদা কেবল একটি বই পড়ে না, বরং বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার গবেষণা করে। এই বৈশিষ্ট্যটি তার চরিত্রকে আরও বাস্তব এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

ফেলুদার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার নৈতিকতা। সে যে কোনো অবস্থায় ন্যায় ও সত্যের পথে চলার চেষ্টা করে। অপরাধ দমনের জন্য সে সবসময় আইন এবং নিয়ম মেনে চলে। এ ছাড়াও, তার মধ্যে রয়েছে মানবিকতা ও সহানুভূতি। সে কখনও নিছক শাস্তির উদ্দেশ্যে অপরাধীদের ধরা পড়ে না, বরং অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করে এবং তাদের ভুল স্বীকার করিয়ে সঠিক পথে ফেরাতে চায়। ফেলুদার শারীরিক দক্ষতা তার গোয়েন্দা কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সে কারাতে জানে এবং এই দক্ষতা তাকে বিপদমুক্ত থাকতে সহায়তা করে। তার ফিজিক্যাল ফিটনেস এবং শারীরিক সক্ষমতা তাকে সাহসী এবং শক্তিশালী করে তোলে। সত্যজিৎ রায়ের গল্পগুলোতে আমরা দেখি, ফেলুদা কেবল বুদ্ধিমত্তা নয়, বরং শারীরিক শক্তির মাধ্যমেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে।

ফেলুদার চরিত্রের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার সহযোগী তোপসে এবং জটায়ু। তোপসে তার সহকারী এবং ভাতিজা, যে সবসময় তার সঙ্গে থাকে এবং তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। জটায়ু, বা লেখক লালমোহন গাঙ্গুলি, একজন জনপ্রিয় রোমাঞ্চ উপন্যাসের লেখক এবং ফেলুদার বন্ধু। তাদের সঙ্গে ফেলুদার সম্পর্ক এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষমতা ফেলুদার চরিত্রকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। সত্যজিৎ রায়ের গল্পগুলোতে ফেলুদার চরিত্র একটি আদর্শ গোয়েন্দার মূর্তি হিসেবে উঠে এসেছে। তার বুদ্ধিমত্তা, নৈতিকতা, শারীরিক সক্ষমতা, এবং সহযোগিতার মনোভাব তাকে একটি সম্পূর্ণ এবং প্রভাবশালী চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সব গুণাবলী তাকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রিয় চরিত্র করে তুলেছে এবং ফেলুদা আজও পাঠকদের মনের মণিকোঠায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সত্যজিৎ রায় লিখিত 'ফেলুদা সমগ্র' বইয়ে ফেলুদার রহস্য উদ্ঘাটনের কিছু কাহিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইন্দ্রজাল রহস্য: ইন্দ্রজাল রহস্য হল সত্যজিৎ রায়ের লেখা ফেলুদা সিরিজের অন্যতম জনপ্রিয় গল্প। গল্পটির মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় বাঙালি পাঠকদের এক দুর্ধর্ষ রহস্যের জগতে নিয়ে যান, যেখানে ফেলুদা এবং তার সঙ্গী তোপসে এবং লালমোহন বাবু এক জটিল কেস সমাধানের জন্য পা বাড়ান। ইন্দ্রজাল রহস্যের গল্পে মোট ছয়টি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ে রহস্য উদ্ঘাটনের কথা বলা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টিতে রয়েছে- 'ম্যাজিক সম্বন্ধেও ফেলুদার যথেষ্ট জান আছে।'

গল্পের শুরুতেই বলা হয়েছে অনেক জিনিসের মতো ম্যাজিক সম্বন্ধেও ফেলুদার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তিনি ফাঁক পেলেই তাসের প্যাকেট হাতে নিয়ে আয়নের সামনে দাঁড়িয়ে হাত সাফাইয়ের অভ্যাস করে। কলকাতায় সূর্যকুমারের ম্যাজিক দেখতে তারা তিনজনই যাবে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যিনি ম্যাজিক শো এর

আয়োজন করেছেন তিনি আর কেউ নন ফেলুদার বন্ধু স্থানীয় এবং রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু, তাই টিকিট চাইতে চাইতেই তিনখানা প্রথম সারির টিকিট পাওয়া গেল। গিয়ে দেখা যায় আসর মোটামুটি ফাঁকা পড়ে আছে। কিন্তু ম্যাজিক যা দেখাল তা নিতান্ত খারাপ নয়, কিন্তু ম্যাজিশিয়ানকে দেখতে অন্যরকম লাগছে, কিছুটা যেন ঘাটতি আছে তার মধ্যে। তাব পরনে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির সঙ্গে একটা চুমকি বসানো সিল্কের পাগড়ি, কিন্তু গলার আওয়াজটা পাতলা। ম্যাজিশিয়ানকে অনর্গল কথা বলে যেতে হয়, কিন্তু সে যেন অনেকটাই কম কথা বলছে। প্রথম সারিতে বসার দরুণ ম্যাজিশিয়ান লালমোহনবাবুকে ডেকে নিলেন স্টেজে এবং একটি পেনসিল লালমোহনবাবুকে দিয়ে জিজেস করলেন চকোলেটটি খেতে কেমন, লালমোহনবাবু সম্মোহন অবস্থায় বললেন, চকোলেটটি খেতে দারুণ।

> "লোকেও উপভোগ করল খুব, লালমোহনবাবু জ্ঞান ফিরে পাবার পরে হাততালি আর থামে না।"[২]

পরদিন রবিবার। লালমোহনবাবু ঠিক ন'টার সময় যথারীতি মতো তার তার সবুজ অ্যামবাসাডারে চলে এসেছিলেন এবং সকলে মিলে গতকালের ম্যাজিকের কথা বলাবলি করছিলেন। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনা গেল, দেখা গেল বছর ত্রিশেকের একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোকটি এটি প্রদোষ মিত্রের বাড়ি কিনা জিজ্ঞেস করলেন। সঠিক উত্তর পেয়ে লোকটি গিয়ে সোফার এক পাশে বসলেন এবং ফেলুদাকে বললেন যে অনেক চেষ্টা করেও টেলিফোনে তার লাইনটা পাওয়া যায় নি। বাধ্যতামূলক তিনি বাড়িতে আসলেন। তার নাম নিখিল বর্মন। তার বাবা সোমেশ্বর বর্মন। তিনি বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান। কিন্তু এখন বছর সাতেক হল তিনি আর ম্যাজিক দেখান না, তিনি নানা দেশ ঘুরে ভারতীয় ম্যাজিক সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং সে সব একটি খাতায় লেখা আছে। তার নাম দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান ম্যাজিক। একজন ব্যক্তি সেটা কিনতে চেয়েছিলেন, দাম দিতে চাইছেন কুড়ি হাজার টাকা। ফেলুদা যখন জিজ্ঞেস করলেন কে এই টাকা দিতে চেয়েছিলেন উত্তরে বললেন সূর্যকুমার নন্দী। এই শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেলেন এবং মনে পরে যায় গতকালই তারা সূর্যকুমারের ম্যাজিক শোতে গিয়েছিলেন। নিখিল বর্মন ফেলুদাকে বললেন যে তার খাতাটি একবার তিনি ফেলুদাকে দেখাতে চান এবং ফেলুদাও আশ্বাস দিয়ে বললেন যে অবশ্যই তিনি খাতাটি দেখবেন কারণ সোমেশ্বরবাবুর সাথে দেখা করার ইচ্ছে তার পূর্ণমাত্রায় আছে।

> "বাবাও আপনার খুব গুণগ্রাহী। বলেন, অমন শার্প বুদ্ধি বাঙালিদের বড় একটা দেখা যায় না। আমার মনে হয়, এর মধ্যে একদিন এসে পড়ুন না। বাবা সন্ধ্যায় রোজই বাড়ি থাকেন।"[৩]

দিন নির্ধারিত হল এবং সময় পড়ল সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ।

রামমোহন রায় সরণিতে সোমেশ্বর বর্মনের পেল্লায় বাড়ি। তারা আগে পূর্ব বঙ্গের জমিদার ছিলেন।কিন্তু পরবর্তীতে কলকাতায় চলে আসেন। ঘরে অধিকাংশ ঘরই ফাঁকা। চাকর বাদে ঘরে লোক মাত্র পাঁচজন। সোমেশ্বর বর্মন, ছেলে নিখিল, মিঃ বর্মনের সেক্রেটারি প্রণবেশ রায়, বন্ধু অনিমেষ সেন এবং একজন শিল্পী রণেন তরফদার। সোমেশ্বর বর্মন এবং ফেলুদা মিলে গল্প করছিলেন, গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি বলে উঠেন তার বাবা ছিলেন একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, সেও ল পড়েছিল কিন্তু ব্যারিস্টারিতে তার আর যাওয়া

হয়নি। তার ঠাকুরদাদা ছিলেন তান্ত্রিক, তাঁর কিছুটা সোমেশ্বর বাবু পেয়েছিলেন। ম্যাজিকে যে তার ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসা সে কথা তিনি ফেলুদাকে বলেন এবং তাদের মধ্যে নানা ধরনের কথাবার্তাও হয়। হঠাৎ করে সোমেশ্বর বাবু একটি বিস্কুট নিয়ে ম্যাজিক দেখালেন।

> "সোমেশ্বরবাবু হঠাৎ সামনের প্লেট থেকে একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে, সেটা হাতের মুঠোয় বন্ধ করে, পরমুহূর্তেই হাত খুলে দেখালেন বিস্কুট- হাওয়া। তারপর সেটা বেরলো লালমোহনবাবুর পকেট থেকে।"[৪]

এমন সময় সোমেশ্বর বাবুর সেক্রেটারি লেখার খাতাটি নিয়ে আসেন এবং কথোপকথনে বোঝা গেল যে খাতাটি ফেলুদা নিয়ে যাবে এবং দুদিন পর ফেরত দিয়ে যাবেন। ফেলুদার পরদিন সকাল পর্যন্ত বইটি পড়া শেষ হয়ে গেছে কারণ ভদ্রলোকের হাতের লেখাটি নাকি মুক্তোর মতোন, বিশ হাজার টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলেও কিনতে রাজি। সকলেই একই কথা বলছে এবং স্থির হল যে সূর্যকুমারকে না করে দেওয়া। কথাগুলো বলতে বলতেই সোমেশ্বর বাবু হঠাৎ বলে উঠেন যে গতকাল তার ঘরে চোর এসেছিল এবং কে জিজ্ঞেস করতেই চোরটি পালিয়ে যায়। ফেলুদা সোমেশ্বর বাবুকে জিজ্ঞেস করেন যে তার ঘরে কোনো দরকারী জিনিস আছে কি না, পরে যখন কৌতূহলবশত ফেলুদা সেটা দেখতে চায়, তখন দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন এবং মিনিট তিনেক পরে এসে একটা ছ'ইঞ্চি লম্বা জিনিস সামনের টেবিলের উপর রাখলেন এবং সকলে দেখতে পায় বংশীবাদক শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি এবং সেটা পঞ্চরত্নের তৈরি। এটা পাওয়া যায় রঘুনাথপুরের রাজা দয়াল সিং এর কাছে ১৯৫৬ তে এবং সোমেশ্বর বাবুর ম্যাজিক দেখে খুশি হয়ে তা দেন। ফেলুদা যখন জিজ্ঞেস করে যে সোমেশ্বর বাবুর বাড়ি দারোয়ান আছে কিনা। তিনি বলেন, দারোয়ানের সঙ্গে আরও চারজন চাকরও আছে। সন্দেহভাজন বশত ফেলুদা সবাইকেই সন্দেহের চোখে দেখছেন এবং সোমেশ্বরবাবুকে বললেন যে,

> "আমরা গোয়েন্দারা এরকম কথা বলে থাকি। সেটা সিরিয়াসলি নেবার কোনও দরকার নেই।"[৫]

সোমেশ্বর বাবু পরিবারের কথা জানতে গিয়ে তিনি বুঝলেন যে সোমেশ্বর বাবু বিপত্নীক এবং তার আরেকটি ছেলে আছে, যার নাম অখিল। সে ভবঘুরে জীবন যাপন করে। সে একটি অস্থির চরিত্র। পরে ফেলুদা বাড়ির আশপাশ ভালো করে ঘুরে দেখলেন এবং সন্দেহ হল চোর বারান্দা দিয়ে আসতে পারবে। কারণ বারান্দা যে দিকে সে দিকে একটি বাগান রয়েছে। তবে সেটাকে খুব যত্ন করে রাখা হয় বলে মনে হয় না। ফেলুদাও প্রায় পনেরো মিনিট ঝড়ির চারপাশ ঘোরাঘুরি করল এবং একটি সংশয় রয়েই গেল যে চোর বাড়ির ভেতরের না বাইরের।

পরেরদিন সোমেশ্বর বাবু টেলিফোনে ফেলুদাকে জানালেন যে সূর্যকুমারের সঙ্গে তার কথা হয়ে গেছে যে তিনি খাতা বিক্রি করবেন না। ফেলুদা, লালমোহনবাবুকে বলেন যে সূর্যকুমারের সঙ্গে তার কথা বলার আছে এবং তিনি কোন হোটেলে আছে তা খবর নেওয়ার জন্য। পরে সে খবর নেওয়ার পর সূর্যকুমারের সঙ্গে ফেলুদার কথা হয় এবং পরের দিন প্রায় সকাল সাড়ে নটায় তিনি ফেলুদার বাড়িতে আসবেন। পরদিন একটি মারুতি গাড়িতে ঠিক সাড়ে ন'টায় সূর্যকুমার আসেন।

লালমোহনবাবু ঠিক ২০-২৫ মিনিট আগেই চলে এসেছিলেন। সূর্যকুমার ফেলুদাকে দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। ফেলুদা বলেন যে তিনি প্রদোষ মিত্র। পরে একে অপরের সঙ্গে আলাপচারিতা করতে গিয়ে ফেলুদা সূর্যকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি কত বছর থেকে ম্যাজিক দেখিয়ে আসছেন। উত্তরে বললেন প্রায় বারো বছর। তিনি নক্ষত্র সেন ঐন্দ্রজালিকের সহকারী ছিলেন পাঁচ বছর এবং বয়সের জন্য ম্যাজিক শো দেখাতে দেখাতে স্টেজেই স্ট্রোক হয়ে মারা যান। সূর্যকুমার যে বাইরে গিয়ে ম্যাজিক শো দেখান তাও বলেন। পরবর্তীতে তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করেন। সূর্যকুমার চলে যাওয়ার পরদিন থেকে সেই একটি সপ্তাহ আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু 'তারপর যেটা হল, সেটা একেবারে বজ্রপাত।' মঙ্গলবার দিন মোমেশ্বরবাবু ফোন করে জানালেন যে তার বহুদিনের বেয়ারা অবিনাশ খুন হয়েছে সেই সঙ্গে সিন্দুক থেকে পঞ্চরত্নের কৃষ্ণ মূর্তিও চুরি হয়ে গেছে। ফেলুদা তৎক্ষণাৎ লালমোহনবাবুকে বলে দিল সোমেশ্বরবাবুর বাড়িতে আসতে। সবাই গিয়ে দেখে ইনস্পেক্টর ঘোষ আসেন এবং ফেলুদার চেনা পরিচিত থাকায় সব বৃত্তান্ত খুলে বলেন যে খুনের কোনো মতলব ছিলনা, সামনে বাধা পেয়ে খুন হয়েছে। আসল উদ্দেশ্য হল সিন্দুক থেকে কৃষ্ণ মূর্তি উধাও করা এবং ইন্সপেক্টরের সন্দেহ মতে তা বাইরের লোকের কাজ। সব বৃত্তান্ত শোনার পর ফেলুদা ইনস্পেক্টরকে জিজ্ঞেস করেন কোন সময় থেকে কোনসময় খুন হয়, ইনস্পেক্টর বলেন রাত একটার থেকে তিনটার ভেতর। ঘরের ভিতর এসে ফেলুদা অন্যান্য সকলেই দেখে যে সোমেশ্বর বাবুর মাথায় চিন্তার ভাঁজত। তাকে অবিনাশের বাড়িতে আসার কতদিন হয়েছে জিজ্ঞাসা করার পর বলে ত্রিশ বছর। খুনটা একতলায় হয়।

চোর সিন্দুক থেকে মুর্তি নিয়ে পালাচ্ছিল এমন সময় হয়তো অবিনাশের ঘুম ভাঙ্গে এবং চোরের সাথে ধস্তাধস্তির সময় চোর তাকে ছুরি মেরে খুন করে। অনেক প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে বেশ কিছু সময়। আসলে গোয়েন্দাদের কাজই তা। আবার ইনস্পেক্টর ঘোষাল এসে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন তিনি সকলকে জেরা করতে চান, উত্তরে ফেলুদা বলে উঠেন,

> "আপনার জেরার পর আমি যদি একটু জেরা করি, তাহলে আপনার আপত্তি নেই তো?"[৬]

উত্তরে ইনস্পেক্টার ঘোষ কোনো অসুবিধে নেই বলে তাকে জানান। যখন ফেলুদা বাগানে হাঁটতেছিলেন তখন ইনস্পেক্টর এসে বলেন তাঁর কাজ শেষ। পরে ফেলুদা নিজে গেলেন এবং সোমেশ্বর বাবুর ছেলে নিখিলকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। অনেক প্রশ্ন করার পর যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন কারো উপর তার সন্দেহ আছে কি না তখন সে বলে মুর্তিটি নেওয়ার পেছনে বাড়ির চাকরেরই হাত আছে।

পরে ফেলুদা সোমেশ্বরবাবুর সেক্রেটারি প্রণবেশ বাবুকে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন যে গত পাঁচ বছর থেকে তিনি সেক্রেটারির কাজ করছেন। তার নিজের বাড়ি একটা ছিল ভবানীপুরে। কিন্তু এ বাড়িতে অনেক ঘর আছে দেখে সোমেশ্বরবাবু তাকে এখানে আসতে বলেন। অনেক জিজজ্ঞাসাবাদের পর জানতে পারল যে সোমেশ্বর বাবুর যিনি ওয়েল পেন্টিং করছিলেন, তিনিও এই বাড়িতেই থাকেন। ফেলুদা গিয়ে তার ঘরে টোকা মারল। ভেতরে গেলেন ফেলুদা।

> “অগোছালো ঘর, যেটা হবে বলে আমি আন্দাজ করেছিলাম। আমরা মোড়া, চেয়ার, বিছানা-মিলিয়ে বসলাম।”[৭]

তার নাম রনেন তরফদার এবং ফেলুদা তখন তাকে জিজজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করলেন। রনেন তরফদার পেন্টিং শেখেন ফ্রান্সে এবং প্রথমে কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টে শিখেন। কিন্তু পেন্টিং বিক্রি করে এখন আর বিশেষ কোনো টাকা রোজগার হয় না। পরে যখন মুর্তির কথা জিজ্ঞাসা করেন যে সে এই মুর্তি সম্বন্ধে জানেন কিনা বা কারো উপরে সন্দেহ আছে কি না তখন সে বলে,

> “বাড়ির লোক এ কাজ করতে পারে না। আমার মনে হয়, চোর সিন্দুক থেকে টাকা নিতে গিয়ে কৃষ্ণটা দেখে সেটা নিয়ে নেয়। তারপর নীচে বেয়ারার সামনাসামনি পড়ে, ওকে খুন করে। আত্মরক্ষা ছাড়া খুনের আর কোনও মোটিভ আছে বলে আমার মনে হয় না।”[৮]

পরে ফেলুদা পেলেন সূর্যকুমার বাবুর কাছে, এবং তার সঙ্গে কৃষ্ণমূর্তি সম্পর্কে কথপোকথন করতে লাগলেন। তারপর গেলেন সোমেশ্বর বাবুর কাছে। তিনি মুহ্যমান অবস্থায় রয়েছেন। ফেলুদা তাকে বললেন যে তার দুঃসময়ে তাকে প্রশ্নবানে বিদ্ধ করা উচিত না, কিন্তু যেহেতু তার কাজ এটা তাই তাকে প্রশ্ন করতে তিনি বাধ্য হচ্ছেন। সোমেশ্বরবাবুর সঙ্গে আলাপ আলোচনায়- ফেলুদার মনে সন্দেহভাজনের সৃষ্টি হয় কারণ তিনি কি যেন বলেও বলতে পারলেন না।

> “আপনার কথায় একটা রহস্যের সুর রয়েছে, সেটা আপনি উদ্ঘাটন করবেন কী? করলে আমাদের সুবিধে হত।”[৯]

তিনি কিছুতেই তা বললেন না, বরং ফেলুদাকে অনুরোধ করলেন এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস না করতে। বাড়ি আসার পর লালমোহন বাবু বলতে থাকলেন যে সোমেশ্বরবাবুর কথাবার্তা কেমন যেন রহস্যে ঘেরা। কিন্তু অরপরও তাঁরা অনুসন্ধান ক্রিয়া চালিয়ে যেতে লাগল।

ফেলুদা অকশন-হাউসের খুব দৃষ্টিপাত করলেন এবং সেটা দেখতে গেলেন। ফেলুদা এবং লালমোহন বাবুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একটি কল আসে। ওপার ইনস্পেক্টর বলে উঠেন কার্লপ্রিট ধরা পড়েছে। তাছাড়া গোপচাঁদ নামে এক চোর জেলে থেকে ছাড়া পেয়ে তার চুরি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় ফেলুদা ফিরে আসেন এবং লালমোহনবাবুকে বলেন-

> “সূর্যকুমারের ম্যাজিক খুব ভালো চলছে না, নিখিল বাবুর দোকানের অবস্থাও ভালো নয়। আর আমাদের আর্টিস্ট রণেন তরফদার গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টের ছাত্র ছিলেন না। প্যারিসে আঁকা শিখেছিলেন কী কনা; সেটা অবিশ্যি জানতে পারিনি।”[১০]

ঘোষের সঙ্গে কথা হওয়ার পর ফেলুদা বলেন যে, খুনি ওই বাড়িরই একজন। ফেলুদা সেদিন বিকেলে সবাইকে নিয়ে সোমেশ্বরবাবুর বাড়ি যাওয়ার জন্য বললেন এবং সেখানেই রহস্য ভেদ করবেন এবং সকলকে বললেন সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য।

বিকেল পাঁচটায় সকলেই উপস্থিত হলেন সোমেশ্বর বাবুর বাড়িতে। ইন্সপেক্টর ঘোষ আর দুজন কন্সটেবল এসে গিয়েছিল আগেই।

ফেলুদা বৃত্তান্ত সহকারে একের পর এক ঘটনা সবাইকে খুলে বলে, এবং নিজেও যে কৃষ্ণ মূর্তি আগলে রাখার দায়িত্বে ছিলেন সেটাও সবাইকে খুলে বললেন। সব ইনস্পেক্টর সূর্যকুমার ওরফে অখিলকে জেল হেফাজতে নিয়ে যান এবং কৃষ্ণমূর্তিটি সোমেশ্বর বুকে ফিরত দিয়ে দেন। বাড়ি ফিরে এসে লালমোহন বাবু ফেলুদাকে বললেন-

> "মশাই, এতদিন আপনার ওপর ভক্তির ভাবই ছিল; এবার ভয় ঢুকল। আপনি যে তস্করের শিরোমনি সেটা তো জানা ছিল না!"[১১]

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি: যার ইংরাজি শিরোনাম Danger In Darjeeling। এটি একটি লিখিত ছোটগল্প যেখানে ডিটেকটিভ হলেন ফেলুদা। ফেলুদা সিরিজের সর্বমোট ৩৫টি সিরিজের মধ্যে এটি প্রথম। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে শিশুদের ম্যাগাজিন 'সন্দেশ' পত্রিকায়। রাজেনবাবু, একজন বয়স্ক সম্মানিত ব্যক্তি যিনি দার্জিলিং-এ বসবাস করেন। একদিন হঠাৎ করেই একটি চিঠি পান। ফেলুদা, তোপসে দার্জিলিং-এ এসেছেন ছুটি কাটাতে, তখনই জানতে পারেন সেই রহস্যমূলক চিঠির কথা এবং রাজেনবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। ডাঃ ফোণি মিত্র ছিলেন রাজেন বাবুর চিকিৎসক। ডাক্তার হলেও তার যে উন্নতিশীল অনুশীলন রয়েছে তেমনটা নয়। তিনি মনে করেন হুমকিমূলক চিঠি পাওয়ার পর রাজেনবাবু যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তা ডাঃ মিত্রকে অর্থ উপার্জনে অনেক সহায়তা করবে। আবার ফেলুদা মিস্টার ঘোষাল, যিনি প্রাচীন জিনিসের বিশেষজ্ঞ তাকেও সন্দেহের চোখে দেখেন। সম্প্রতি রাজেনবাবু অনেক অ্যান্টিক জিনিস সংগ্রহ করে রেখেছেন, তাই মিঃ ঘোষাল হলেন তার প্রতিদ্বন্দী। তার চিন্তা যদি রাজেনবাবু অসুস্থ হন তবে কিউরিও কিনতে আর বাইরে যেতে পারবেন না এবং তিনি এইসব বস্তু কিনতে সক্ষম হবেন, সঙ্গে প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব জিনিস ঘরে রাখার সুবাদে তার অনেক নাম হবে। রাজেনবাবুর ছেলে প্রবীর মজুমদার, যাকে রাজেনবাবু আলমারি থেকে টাকা চুরি করার দায়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন, তাকেও দার্জিলিং-এ দেখা গেছে। সুতরাং ফেলুদার সন্দেহ তার উপরেও রয়েছে। কারণ সে তার বাবার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার দায়ে সন্দেহমূলক চিঠি পাঠাতেই পারে।

> "আমি শুনেছি অনেক কথা। ছেলেটি অল্প বয়সে বখে গিয়েছিল। বাপের সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করে ধরা পড়েছিল।"[১২]

একদিন রাজেনবাবু অত্যন্ত ফ্যাকাশে মুখে ফেলুদা এবং তোপসেকে জরুরি তলব পাঠালেন, তার সাথে খুব শীঘ্রই দেখা করার জন্য। এসে দেখলেন ডাক্তারবাবু রাজেনবাবুর চিকিৎসা করছেন এবং ফেলুদাকে দেখে বললেন যে আগের রাতে তিনি খুব ভয় পেয়েছিলেন,যখন মধ্যরাতের পর দেখেন একজন মুখোশধারী লোক তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি দেখতে ছিল ভয়ঙ্কর ভীতিকর। ডাঃ মিত্র চলে যাওয়ার পর রাজেনবাবুর ভাড়াটে বলে উঠেন কোনো এক কাজে তাকে কলকাতায় যেতে হবে এবং রাজেনবাবুকে

আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে তিনি পুলিশকে খবর দিবেন কারণ রাজেনবাবুর সুরক্ষার এখন খুব প্রয়োজন। তিনকোড়ি বাবু চলে যাওয়ার পর ফেলুদা সিদ্ধান্ত নিলেন যে রাতে রাজেনবাবুর বাড়িতেই থাকবেন।

> "... আমরা যদি আজ রাতটা ও ঘরে এসে থাকি, তা হলে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি?"[১৩]

ফেলুদা চলে যাওয়ার পর তোপসে শুয়ে পড়ে। হঠাৎ ঘরে একজন অন্য লোকের উপস্থিতি টের পেয়ে তোপসে চমকে উঠে এবং দেখতে পারে ফেলুদা একটি মুখোশ পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তখন সে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করে এই মুখোশটি কার। অন্যদিকে তোপসে মুখোশে থাকা চেরুটের গন্ধ শনাক্ত করে এবং বুঝতে পারে যে মুখোশটি সে সময় কে পড়েছিল। তাদের মনে একটি সন্দেহ জাগে যে তিনকোরিবাবুর আসল উদ্দেশ্য কী হতে পারে এমন কাজ করার। পরেরদিন সকালে তিনকোরিবাবুর কাছ থেকে রাজেনবাবু একটি চিঠি পান তখন সবাই তার আসল রহস্য বুঝতে পারেন। চিঠিতে লেখা আছ রাজেনবাবু তার সাথে যে অন্যায় করেছেন তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি এ কাজ করেছেন। ছোটবেলায় যখন তারা একসাথে স্কুলে পড়াশোনা করতেন তখন রাজেনবাবু তিনকোরিবাবুর পরি অনেক শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত করেছিলেন। যখন রাজেনবাবুর বাড়িতে সে তার ছবি দেখে তখন তাকে চিনতে পেরেছিল এবং ছোটবেলার সেই প্রতিশোধের আগুন আবার জ্বলতে থাকে। প্রতিশোধের স্পৃহা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় যে তিনকোরিবাবু রেগে গিয়ে সেই ভয়ঙ্কর কাজটি করে বসেন।

গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি যে একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি এবং হুমকিমূলক চিঠির উল্লেখ গল্পকে একটি অনন্য মাত্রা দান করে। ফেলুদা অনেকটা তথ্য ধরে ধরে শেষ পরিণতির দিকে পৌঁছান। পাঠকরাও ক্লুগুলির উপর অনেক ফোকাস করেন। তিনকোরিবাবু প্রতিশোধের জ্বালায় এতটাই দগ্ধ হয়ে গেলেন যে তিনি যেই রাজেনবাবুর বাড়িতে যখন তার ছবি দেখলেন, তখন তার প্রতিশোধের আগুন ধাও ধাও করে জ্বলতে থাকল এবং রাজেনবাবুর প্রতি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন।

প্রদীপ জ্বালানোর পর্বেই আসে সলতে পাকানোর পর্ব, কারণ শুরুর আগেই শুরু হয় আরেক অধ্যায়ের। হঠাৎ করেই ব্যোমকেশ, শার্লক হোমসের জন্ম হয়নি। তারও রয়েছে এক ইতিহাস এক বিবর্তন। বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই গোয়েন্দা সাহিত্যের আসর জমে উঠে। এই সাহিত্যে স্বনামধন্য লেখকরা দলে দলে যোগদান করেন। তাদের মধ্যেই খ্যাত হলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। 'ভারতী' গোষ্ঠীর অধ্যায়ে হেমেন্দ্রকুমার রায় ছিলেন বহুমূখী বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। 'যখের ধন' গল্প দিয়ে তাঁর গোয়েন্দা সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে তিনি একের পর এক গল্প লিখেন। হেমেন্দ্রকুমারের পরেই কিশোর সাহিত্যে যিনি সাড়া ফেলেছিলেন তিনি হলেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র ফেলুদা, পাঠকমনে এক প্রাণের সঞ্চারের বীজ রোপণ করেছিল। তারপরে আসেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যোমকেশ'। ফাঁদ পেতে তিনি অপরাধীকে শনাক্ত করেন। ফাঁদ পাতা থেকে ধরা পর্যন্ত পাঠকরা থাকেন রুদ্ধশ্বাসে। ব্যোমকেশ এবং বরদা গল্পের খানিক অংশ তুলে ধরা হলো-

> "অতঃপর অন্ধকারে বসিয়া আমাদের পাহারা আরম্ভ হইল। চুপচাপ তিনজনে বসিয়া আছি, নড়ন-চড়ন নাই; নড়িলে বা একটু শব্দ করিলে ব্যোমকেশ বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। সিগারেটে

অগ্নিসংযোগ করিয়া যে সময়ের অন্ত্যেষ্টি করিব তাহারও উপায় নাই, গন্ধ পাইলে শিকার ভড়কাইয়া যাইবে।.. এই তো কলির সন্ধ্যা- ভাবিতে ভাবিতে একটা অদৃশ্য হাই তুলিবার জন্য হাঁ করিয়াছি, হঠাৎ ব্যোমকেশ সাঁড়াশির মতো আঙুল দিয়া আমার উবু চাপিয়া ধরিল। হাই অর্ধপথে হেঁচকা লাগিয়া থামিয়া গেল। জানলার কাছে শব্দ। চোখে কিছুই দেখিলাম না, কেবল একটা অস্পষ্ট অতি লঘু শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়া গেল। তারপর আর কোনো সাড়া নেই। নিশ্বাস রোধ করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলাম, বাহিরে কিছুই শুনিতে পাইলাম না-শুধু নিজের বুকের মধ্যে দুন্দুভির মতো একটা আওয়াজ ক্রমে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল।"[১৪]

বাংলা রহস্য গল্পের সময়ের অভিজ্ঞান ও চরিত্র শিল্প একটি অনন্য মিশ্রণ, যা পাঠকদের মুগ্ধ করে রাখে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চরিত্রগুলি গল্পের গতিপথে প্রভাব ফেলে এবং পাঠকদের মধ্যে কৌতূহল ও উত্তেজনা জাগায়। এই চরিত্রগুলি এবং সময়ের অভিজ্ঞান গল্পগুলিকে আরও প্রাণবন্ত এবং বাস্তবসম্মত করে তোলে। এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে, সময়ের অভিজ্ঞান এবং চরিত্র শিল্প বাংলা রহস্য গল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চরিত্রগুলি গল্পের বুনন এবং পাঠকের অনুভূতির উপর গভীর প্রভাব ফেলে। ভবিষ্যতের বাংলা রহস্য গল্পে এই উপাদানগুলি আরও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

তথ্যসূত্র:

১) ঘোষ অধ্যাপক অমলেশ, বাঙালি রহস্য সাহিত্য: অতীত ও বর্তমান, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্টা ৩৩।
২) রায় সত্যজিৎ, ফেলুদা সমগ্র ২, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্টা ৪২৫।
৩) তদেব, পৃষ্টা ৪২৬।
৪) তদেব, পৃষ্টা ৪২৭।
৫) তদেব, পৃষ্টা ৪২৮।
৬) তদেব, পৃষ্টা ৪২৮।
৭) তদেব, পৃষ্টা ৪৩০।
৮) তদেব, পৃষ্টা ৪৩১।
৯) তদেব, পৃষ্টা ৪৩২।
১০) তদেব, পৃষ্টা ৪৪০।
১১) তদেব, পৃষ্টা ৪৪২।
১২) রায় সত্যজিৎ, ফেলুদা সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স ২০০৫, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্টা ১৩।
১৩) তদেব, পৃষ্টা ১৬।
১৪) গঙ্গোপাধ্যায় পার্থজিৎ, গোয়েন্দা-সাহিত্যে ব্যোমকেশ বক্সী ও অন্যান্য, একুশশতক, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্টা ২৫।